পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

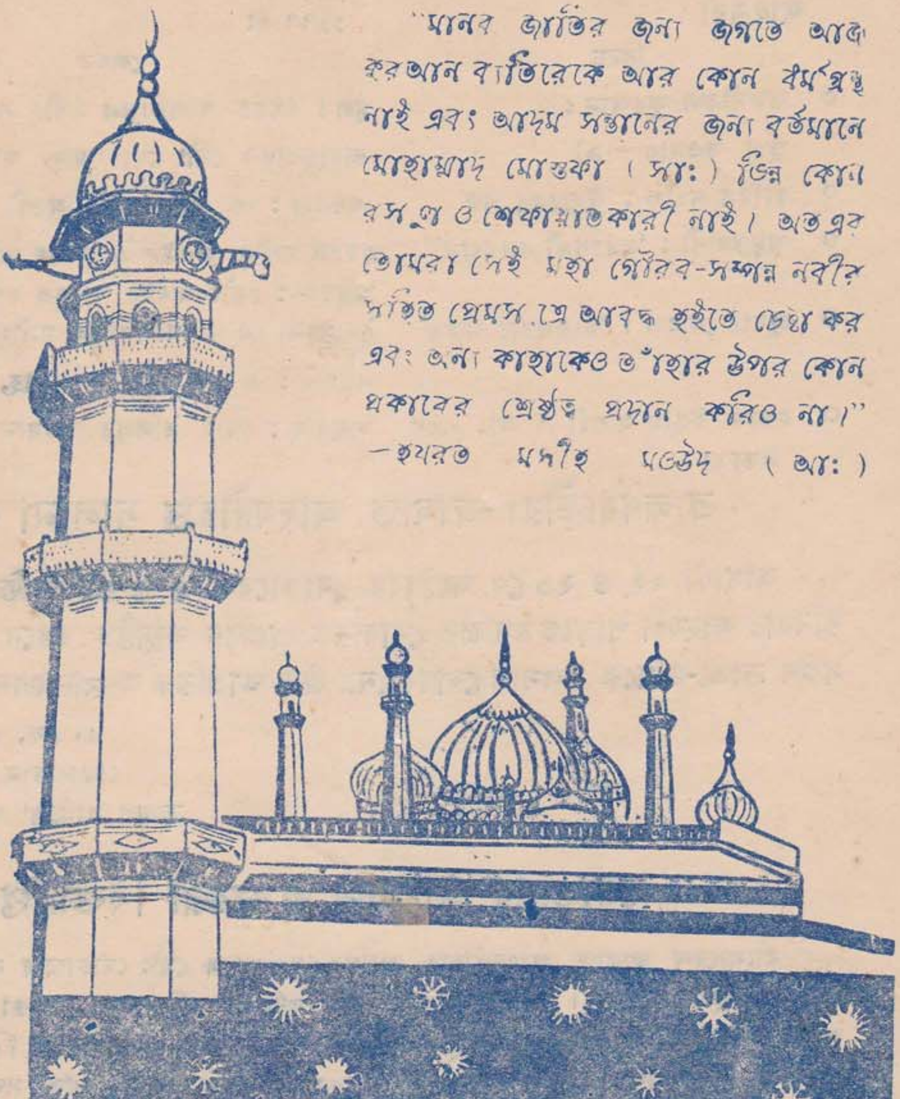

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন ১৩৮৪ বাংলা : ১৫ই অক্টোম্বর ১৯৭৭ ইং : ১লা জিলকদ ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই অক্টোবর ১৯৭৭ ইং

৩১শ বর্ষ ১১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃ :
০ তফসীরুল-কুরআন : সুরা কওসার—(৯)	মুল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'ঈমানের অঙ্গ'	অনুবাদ : এ. এইচ. এম, আলী আনওয়ার	৬
০ অমৃতবাণী : 'মর্মস্পর্শী আহবান'	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মদ	৭
০ জুমার খোৎবা : 'তাকওয়ার গুরুত্ব'	সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ কে, এম, মুজিবুল্লাহ্,	১১
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা	অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	১৭

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসা

আগামী ২২ ও ২৩শে অক্টোবর মোতাবেক ৫ ও ৬ই কার্তিক রোজ শনি ও রবিবার আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ মোবারক প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাআল্লাহ। সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে জলসায় যোগদানের জন্য আন্তরিক আহ্বান জানান যাইতেছে।

এ, এফ, এম, ইসমাইল,
চেয়ারম্যান জলসা কমিটি,
ব্রাহ্মণ বাড়িয়া জামাত আহ্‌মদীয়া।

দোওয়ার আবেদন ও জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার আমির মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব পক্ষকালাধিক হইতে অসুস্থ আছেন। ক্রমাগত জ্বর এবং দুর্বলতা রহিয়াছে। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ তাঁহার আশু রোগমুক্তি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন। তিনি ঢাকার কেন্দ্রীয় আহ্‌মদীয়া মসজিদ নির্মাণ ফাণ্ডে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট অতি সত্তর মুক্ত হস্তে দান করার জন্য আহবান জানাইয়াছেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর নির্দেশ ও দোওয়া অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখার এবং সুসম্পন্ন করার জন্য এই মুহূর্তে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির ধার্যকৃত চাঁদা অনতিবিলম্বে আদায় করা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্‌তায়ালা, আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার এবং তাঁর অধিকতর রহমতের উত্তরাধিকারী হওয়ার তওফিক দান করুন। আমিন।

جِلۡلُرۡ রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১১ম সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন ১৩৮৪ বাং : ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৭ ইং : ১৫ই এখা, ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কবীর'—

সূরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখন আমরা ইব্রাহীমী দোওয়ার يعلمهم الكتاب অংশের আলোচনা করিব। নবী দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। এক সাহেবে শরীয়ত এবং আর এক শরীয়ত বিহীন। উভয়েই কেতাব শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রভেদ এই যে প্রথম জন কেতাব আনেন এবং দ্বিতীয় জন কেতাব আনেন না। দ্বিতীয় জন সাবেক নবীর সচল কেতাব শিক্ষা দেন। যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ) সাহেবে শরীয়ত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার মোকাবেলা শরীয়ত-ধারী ও শরীয়ত বিহীন সকল নবীর সহিত হইবে। বর্তমানে আমরা তাঁহার সহিত শরীয়তধারী নবীগণের মোকাবেলা করিব। শরীয়তধারী নবীগণের উপর তাঁহার ফযিলত সাব্যস্ত হইয়া গেলে, আপনা আপনি শরীয়ত বিহীন নবীগণের উপর তাঁহার প্রাধান্য সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। কারণ শরীয়ত বিহীন নবীগণ যাঁহাদের শরীয়ত বহন করিয়া চলেন, তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা মর্যাদায় ন্যূন হইয়া থাকেন।

কুরআন করীমের দৃষ্টিতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্বে দুই জন শরীয়তধারী নবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যথা :— ১) হযরত নূহ (আঃ) এবং ২) হযরত মুসা (আঃ)। হযরত মুসা (আঃ)-এর কেতাব তওরাত বর্তমান আছে, কিন্তু হযরত নূহ (আঃ)-এর কেতাব পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে কেবল এতটুক উল্লেখ আছে যে وان من شيعته لابراهيم অর্থাৎ, "হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিশ্চয় হযরত নূহ (আঃ)-এরই জামাত হইতে ছিলেন। শরীয়ত ছিল নূহ (আঃ)-এর এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার অনুগমনকারী ছিলেন।" (সূরা-সাফফত ৩য় রুকু) অপর দিকে

হযরত দাউদ (আঃ); হযরত যাকারীয়া (আঃ) হযরত সোলেয়মান (আঃ) এবং ইয়াহিয়া (আঃ) প্রভৃতি নবীগণ সকলে অধীন ছিলেন হযরত মুসা (আঃ)-এর শরীয়তের। এই দুই শরীয়তধারী নবী ব্যতিরেকে কুরআন করীমে এক সূত্র বর্ণিত হইয়াছে ان من امة الا خلا فيها نذير অর্থাৎ "দুনিয়াতে এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের নিকট আমার পক্ষ হইতে নবীর আবির্ভাব না হইয়াছে।" (সুরা ফাতের তৃতীয় রুকু)। বাহ্যতঃ তাঁহাদের অবস্থা নবীগণের অবস্থার সহিত মিলে। অবশ্য কালের গতিতে মানুষের হস্তক্ষেপে তাঁহাদের জীবনীর সহিত অনেক আজগুবি কেস্‌সা প্রক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইগুলি দেখিয়া যদি আমরা ঐ সকল নবীকে অস্বীকার করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের ধর্মকেই অস্বীকার করিতে হইবে। যেমন কোন হিন্দু যদি আসিয়া বলে যে, বেদ ঐশী গ্রন্থ এবং তাহাদিগের মধ্যেও নবীর আবির্ভাব হইত এবং আমরা বলি যে মিথ্যা কথা ; সে যদি আবার বলে যে, তাহাদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ নামে এক নবী আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার কেতাব বর্তমান আছে, যাহার মধ্যে অনেক ইলহাম লিপিবদ্ধ আছে এবং আমরা বলি যে সম্পুর্ণ মিথ্যা কথা ; পুনঃরায় সে যদি বলে যে ভারতে বুদ্ধ নামে এক নবী আসিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত আল্লাহ্‌তায়ালা কথা বলিতেন এবং আমরা বলি যে, (নউযুবিল্লাহ্) তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন, অতঃপর সে যদি কুরআনের হাওয়ালা দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসে যে তোমাদের কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সকল জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব করিয়াছিলেন, এখন যদি শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র এবং বুদ্ধদেব নবী না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ভারতে কাহারা নবী হইয়া আসিয়াছিলেন বল, তখন আমাদিগের নিকট ইহার কি উত্তর আছে? যদি উপরুক্ত তিনজনকে আমরা মিথ্যাবাদী বলি, তাহা হইলে আর কাহাকে নবীরূপে পেশ করিব? জানা নবীগণকে বাদ দিলে অজানা নবী কোথায় পাওয়া যাইবে? তখন একমাত্র উত্তর এই হইবে যে আমরা জানি না। ইহাতে প্রশ্নকারী আলোচ্য আয়াতের দৃষ্টান্তমূলক প্রমাণ দিয়া কুরআন মজিদের সত্যতা সাব্যস্ত করিয়া বলিবে, আমরা কি জবাব দিব? তখন হয় যুক্তিহীন গোঁড়া ব্যক্তির ন্যায় হটকারিতা করিয়া কেবল না না করিতে হইবে, না হয় এক পাঠানের ন্যায় করিতে হইবে, যে একটাকার খরবুযা কিনিয়া যখন দেখিল উহা ফিকা, তখন উহার উপর রাগে প্রস্রাব করিয়া মজদুরী করিতে চলিয়া গেল। অতঃপর যখন তাহার ক্ষুধা পাইল, তখন সে খরবুযার নিকট ফিরিয়া আসিয়া একটা উঠাইয়া লইয়া মনে মনে বলিল আমি তো ইহার উপর প্রস্রাব করি নাই এবং এই বলিয়া সে উহা খাইয়া ফেলে। প্রত্যেকবার ক্ষুধা লাগার

পর সে বার বার আসিয়া এক একটা খরবুযা উঠায় এবং খাইয়া ফেলে। যখন শেষ খরবুযার পালা আসিল, তখন সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া উহা হাতে উঠাইয়া লইয়া বলিল, আরে যেগুলোর উপর আমি প্রস্রাব করিয়াছিলাম, সেগুলো তো খাইয়া ফেলিয়াছি, এটার উপর তো আমি প্রস্রাবই করি নাই। ইহা বলিয়া সে শেষ খরবুযাটিও খাইয়া ফেলিল। এই অবস্থা আমাদের হইবে। প্রথমে তো আমরা সব নবীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উড়াইয়া দিব, পরে হিন্দুস্থানে নবী দেখাইবার জন্য জোর দাবীর চোটে নিরুপায় হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে, চল রামচন্দ্রকে নবী বলিয়া মানিয়া লইলাম, শ্রীকৃষ্ণকে নবী বলিয়া মানিয়া লইলাম এবং বুদ্ধদেবকেও নবী বলিয়া মানিয়া লইলাম। কুরআন মজিদের সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য যখন নবীদেরকে আমাদের মানিতেই হইল, তখন প্রথমেই আমরা তাহাদিগকে কেন মানিয়া না লই?

শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে আমাদের সুফী ও ওলীগণ স্বপ্নে দেখিয়াছেন। এক ব্যক্তি মযহার জানেজানানের নিকট আসিয়া বলিল, রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যাবাদী ছিল। আমি স্বপ্নে এক প্রজ্জলিত অগ্নি দেখিলাম। উহার মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডায়মান দেখিলাম এবং রামচন্দ্র কিনারায় খাড়া দেখিলাম। মনে হইতেছে উভয়ে মিথ্যাবাদী ছিল। তাহারা জাহান্নামে রহিয়াছে। মযহার জানেজানান বলিলেন, স্বপ্নের তাবীর স্বপ্নের ভাষায় হইয়া থাকে। অগ্নির অর্থ হইল আল্লাহ্‌র মুহাব্বত। শ্রীকৃষ্ণ অগ্নির মধ্যে খাড়া থাকার অর্থ হইল তিনি আল্লাহ্‌র মুহাব্বতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং রামচন্দ্র যেহেতু তাঁহার চেয়ে মর্যাদায় ছোট সেই জন্য তাঁহাকে কিনারায় দেখিয়াছ।

মোট কথা কুরআন মজিদের ইহা দাবী যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব হইয়াছে। যদি কেহ আসিয়া বলে, আমাদের জাতির মধ্যে অমুক নবী আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনীর মধ্যে নবুওতের ঝলক থাকে, তাহা হইলে আমরা হিন্দু, ইহুদী, খৃষ্টান সকলকেই বলিব, দেখ, আমাদের জন্য কাজ কত সহজ। কুরআনের কথার সহিত তোমাদের কথা মিলিয়া যাইতেছে। কিন্তু এক ইহুদী হযরত মুসা (আঃ)-কে নবী বলিলে, হিন্দু তাহা স্বীকার করিবে না। ইরানে জরথুস্ত নবী আসিয়াছিলেন বলিলে, হিন্দু এবং ইহুদী মানিবে না। কারণ কুরআন মজিদ ব্যতিরেকে অন্য কোন গ্রন্থে সকল জাতির নিকট নবী প্রেরিত হওয়ার কোন সংবাদ নাই। সেইজন্য যখনই কোন জাতি অন্য কোন জাতির মধ্যে নবীর আগমন হইয়াছিল শুনিবে, তখন তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইবে। কিন্তু একজন

কুরআন মজিদের অনুগামীর নিকট যে কোন জাতি তাহাদের মধ্যে নবী আসিয়াছিলেন বলিয়া নবীগণের নাম পেশ করিলে, সে ইহাই বলিবে, সুবহান আল্লাহ্, আমার জন্য বিষয়টি কত সহজ করিয়া দিলে, কুরআনের সত্যতা যাচাই করার জন্য আমাকে আর তোমাদের মধ্যে কে নবী হইয়াছিলেন, তাহা কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইল না, তুমি নিজেই তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত নবীর নাম আনিয়া কুরআনের সত্যতা সাব্যস্ত করিয়া দিলে। যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে, বল হিন্দুস্থানে কে নবী হইয়াছিলেন, তাহা হইলে আমি মুস্কিলে পড়িয়া যাইতাম। অনুরূপভাবে চীনে যাইলে যখন চীনাদের নিকট শুনিব যে, সেখানে কনফিউশিয়াস নবী হইয়াছিলেন, তখন বিষয়টি আমার ধর্মের জন্য সহায়ক হইবে। কিন্তু প্রত্যেক জাতির জন্য অন্য যে কোন জাতির মধ্যে নবী আসিয়াছিলেন শুনিলে, অস্থিরতা ও অস্বস্তির সৃষ্টি হইবে। মোট কথা, যে সকল জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহাদের অনুগামীগণ নিজেদের সংশোধন করার ফলে রক্ষা পাইয়াছে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া শুনিব, তখনই আমরা আলহামদোলিল্লাহ বলিয়া তাঁহাদিগকে নবী বলিয়া মানিয়া লইব। কারণ কুরআন মজিদের শিক্ষা মূলে সত্য নবীর প্রমাণ ইহাই।

সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই জন জানা নবী হযরত জরথুস্ত এবং হযরত মুসা (আঃ) শরীয়ত-ধারী নবী ছিলেন। তাঁহাদের কেতাব পাওয়া যায়। বেদের ঋষীগণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য এক কালে বেদের মাধ্যমে শরীয়ত নাযেল হইয়াছিল, কিন্তু কাহার উপর নাযেল হইয়াছিল উহার সদুত্তর কেহ দিতে পারে না। অতএব আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত অজানা ঋষীগণের মুকাবিলা করা সম্ভবপর নহে। অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর শরীয়ত হারাইয়া গিয়াছে। সমুরাবী নামে এক ব্যক্তির কিছু এলহাম এবং তৎসহ কিছু তৌহিদ ও নীতি সুন্দর নীতি শিক্ষা প্রসিদ্ধ আছে। এসবের পূর্ণ বিবারণ পাওয়া যায় না এবং ইহারও সন্ধান পাওয়া যায় না যে তিনি কোন্ শরীয়ত আনিয়াছিলেন অথবা তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ শিক্ষা ও নীতিগুলি তাঁহার পূর্ববর্তী কোন শরীয়তধারী নবীর বিলুপ্ত গ্রন্থ হইতে আহরিত। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে পূর্ববর্তী মাত্র দুই জন নবী বাকী থাকিয়া যান, যাঁহাদের শরীয়ত আমাদের জানা আছে। যথা (১) হযরত জরথুস্ত (আঃ) এবং হযরত মুসা (আঃ)। দুনিয়ার কোনো নবী তাঁহার শিক্ষাকে গোপন রাখিতে

পারেন না। ইহা কি ভাবে হইতে পারে যে, খোদাতায়ালা কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পয়গাম দিয়া মানুষের নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত ব্যক্তি সেই পয়গামকে গোপন করে। তিনি শরীয়তকে কোনো রূপে গোপন করিতে পারেন না। অবশ্য কোনো কোনো ইলহামকে ক্ষেত্র বিশেষে প্রকাশে বিলম্বিত করা যাইতে পারে। যেমন আঁ-হযরত (সাঃ) যখন বদরের ময়দানের দিকে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, মক্কা হইতে আগমনকারী লস্করের সহিত তাহাদের মোকাবেলা হইবে, কিন্তু সঙ্গে ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তখনই যেন সাহাবা (রাঃ আঃ) কে এ সংবাদ না দেওয়া হয়। পরে প্রয়োজন মুহূর্তে তিনি তাহাদিগকে এ সংবাদ জানান। ইহা সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর পরীক্ষা লইবার জন্য এক পন্থা ছিল। কিন্তু শরীয়ত নির্দেশিত শিক্ষা গোপন করা যায় না। যেহেতু সকল নবী কেতাব শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। সেই জন্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)ও যখন কেতাব শিক্ষা দিতে আসিয়া ছিলেন, তখন অন্যদের উপর তাঁহার প্রাধান্য কিভাবে সাব্যস্ত হইবে? ইহার জবাব এই যে মোকাবেলা শিক্ষাদানের প্রশ্নে নহে বরং পূর্ণ শিক্ষাদানের প্রশ্নে। শিক্ষা প্রচারের ব্যাপারে সকল নবী একই পর্যায়ে পড়েন কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) যাহা কিছু পইয়াছিলেন, উহাতে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। যেমন الكتاب "আল-কেতাব" শব্দে "আল" ال বাড়াইয়া আরবী অভিধান অনুযায়ী কেতাবের পূর্ণতার দিকে নির্দেশ করিতেছে। তদনুযায়ী يعلمكم الكتاب আয়াতে বলা হইয়াছে যে, এই নবী তোমাদিগকে কামেল কেতাব শিক্ষা দেন। অতএব কেতাব শিক্ষা দেওয়া এবং আল-কেতাব শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে প্রভেদ অনেক। সকল নবী কেতাব শিক্ষা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) আল-কেতাব শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি যে, শরীয়তধারী জানা নবী দুই জন। হযরত মুসা এবং হযরত জরথুস্ত। একজনের কেতাব তৌরাত এবং অন্যজনের আবেস্তা। আমরা যখন কুরআন মজিদের সহিত উক্ত দুইটি কেতাবের মোকবেলা করি, তখন আমাদের চক্ষে বিরাট প্রভেদ ধরা পড়ে। তাহা হইল—(১) তালীমের উদ্দেশ্য কুরান মজীদ ব্যতিরেকে কোন কেতাবে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌তায়ালা আমোদ করিবার জন্য শরীয়ত নাযেল করেন নাই। যেমন পূর্বকালে স্পেন দেশের বাদশাহরা গরু লড়াইয়া এবং হিন্দুস্থানের বাদশাহরা হাতী লড়াইয়া আমোদ উপভোগ করিত, খোদাতায়ালা আমাদিগকে লইয়া তাহা করিতে পারেন না। শীতের রাত্রে আরামের বিছানা ও ঘুম ছাড়িয়া উঠিতে বলিয়া আমাদিগকে দিয়া ওজু করাইয়া কি তিনি আকাশে বসিয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসেন? তিনি কি আমাদিগকে রোযা রাখিতে আদেশ দিয়া, আমাদের ক্ষুৎ-

পিপাসায় চক্ষে অন্ধকার ও দুর্বলতায় চলিতে অক্ষমতা দেখিয়া অট্যহাস্য করেন? তিনি এ সব ক্ষুদ্রতার বহু উর্ধে অবস্থিত। তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য শরীয়ত নাযেল করিয়াছেন

দুনিয়ার শাসকগণ যখন আইন প্রণয়ন করে তখন কচিৎ উহার মধ্যে কোন লঘু বিষয় থাকে। সাধারণতঃ প্রত্যেক বিধি নিষেধের মধ্যে প্রজার কল্যাণ নিহিত থাকে। কিন্তু একমাত্র কুরআন মজিদ ব্যতিরেকে বাকী সকল ধর্মগ্রন্থ লঘু বস্তু হিসাবে পেশ করিয়াছে। বেদ হস্তক্ষেপে ভরা। উহার মধ্যে শরীয়তের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তৌরাত ও যিন্দাবেস্তা পড়িলে বুঝা যায়, এই দুইটির মধ্যে শরীয়ত মওজুদ আছে। কিন্তু শরীয়তের উদ্দেশ্য যে মানুষের সংশোধন ও কল্যাণ ইহা বলা বা বুঝানো হয় নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা চাহিয়াছেন তোমরা এরূপ কর, অতএব অন্ধভাবে তোমাদিগকে এরূপ করিতে হইবে। ইহাতে শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা বাতিল হইয়া যায়। অবশ্য ঐ দুইটি শরীয়তে মানুষের ফায়দার কোনো কোনো ভাল কথা আছে। কিন্তু কচিৎ এরূপ দুই একটা নিয়ম পাওয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। একমাত্র কুরআন মজিদ এই দাবী রাখে যে, উহার প্রত্যেকটি বিধিনিষেধ মানুষের কল্যাণের জন্য আরোপ করা হইয়াছে। অবশ্য আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো কোনো সময় বান্দার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি বান্দার বৃহৎ কল্যাণের জন্যই এরূপ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন মজিদে বলিয়াছেন :—

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم

"কুরবানীর আদেশ দেওয়ার আমার এ উদ্দেশ্য নহে যে, উহাদের রক্ত এবং মাংস আমার নিকট পৌঁছে, পরন্তু সেই তকওয়া আমার নিকট পৌঁছে, যদ্বারা প্রণোদিত হইয়া তোমরা কুরবাণী কর, নচেৎ আমি তো তোমাদিগকেই গোস্ত খাওয়াইয়া থাকি। তোমাদের মধ্যে আন্তরিকতা, ভীতি, নেকী এবং শুচিতা সৃষ্টি করার জন্য তোমাদিগকে দিয়া কুরবাণী করাইয়া থাকি। এ আদেশ কোনো খেয়ালী ব্যাপার নহে।" (সুরা হজ-৫ম রুকু)। (ক্রমশঃ)

"এবং যাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাহাদিগকে তিলে তিলে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। যেদিন উহাকে দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া উহার দ্বারা জমাকারীদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে ছেঁকা দেওয়া হইবে, (তখন বলা হইবে), ইহা সেই বস্তু, যাহা তোমার বাসনার জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে, উহার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সুরা তওবা-৫ম রুকু)।

হাদিস শরীফ

২৩। ইস্‌লাম ও ইহার প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (আরকান)।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১২১। হযরত উসমাহ বিন্ যায়দ (রাঃ আঃ) বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে জুহাইনা গোত্রের মরুদ্যানের দিকে পাঠাইলেন। আমরা ভোরের সময়ে তাহাদের প্রস্রবন গুলি-তেই যাইয়া তাহাদিগকে পাইলাম। আমি এবং এক আন্‌সারী তাহাদের এক ব্যক্তির পাশ্চাদ্ধাবন করিলাম। যখন আমরা তাহাকে নাগাল পাইলাম এবং পরাস্ত করিলাম, তখন সে বলিয়া উঠিল: খোদা ছাড়া কোন মাবুদ নাই। অর্থাৎ সে প্রকাশ করিল যে সে মুসলমান। এই কথায় আমার আনসারী সাথী ত থামিলেন। কিন্তু আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ছাড়িলাম। যখন আমরা মদিনায় ফিরিয়া আসিলাম এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এই ঘটনা নিয়া আলোচনা হইল, তখন তিনি ফরমাইলেন: "উসামা, কলেমা তৌহিদ পাঠ সত্বেও তুমি তাহাকে কতল করিয়াছ? তুমি কি সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা সত্বেও তাহাকে হত্যা করিয়াছ?" হুজুর (সাঃ আঃ) বার বার ইহা দোহরাইতেছিলেন, এমন কি আমার আগ্রহ হইল 'হায়, আজিকার পূর্বে যদি আমি মুসলমান না হইতাম, (আর আমার এই ভুল না হইত)। এক রেওয়ায়েতে আছে যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "সে যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' স্বীকার করিল, তবু তুমি তাহাকে বধ করিয়াছ?" আমি নিবেদন করিলাম: "হে আল্লাহর রসুল (সাঃ)। সে অস্ত্রের ভয়ে এরূপ কহিয়াছিল।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'তুমি কেন তাহার হৃদয় অস্ত্রপচার করিয়া দেখ নাই যে সে দেল হইতে বলিয়াছিল কি না?' হুজুর (সাঃ আঃ) একথা এত বার পুনঃ পুনঃ বলিলেন যে, আমার মনে হইতে লাগিল, হয়! আজই যদি আমি মুসলমান হইতাম। আর এই ভ্রম আমার আমল নামায় লিখিত না হইত।"

[বুখারী, কেতাবুল মাগাযী, ২ : ৬১২ পৃঃ]

('হাদিকাতুন সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ :)— এ, এইচ এম আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

'দরদে-দেলের সহিত কওমের প্রতি এক মর্মস্পর্শী আহবান'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আক্ষেপ! এই সকল লোক সূক্ষ্ম-দর্শিতার সহিত বিবেচনা করে না। আমি একজন রুগ্ন ব্যক্তি, এবং 'দুইটি হলুদ চাদরে' আমাকে জড়ানো হইয়াছে—হাদিসে যে দুইটি চাদর আবৃতাবস্থায় মসীহ নাযেল হইবেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সে দুই চাদরই আমায় দেওয়া হইয়াছে, যাহার অর্থ 'এলমে তা'বীরুর রো'ইয়া' (স্বপ্ন-তত্ব) অনুযায়ী দুইটি রোগ বুঝায়। সুতরাং একটি চাদর (রোগ) আমার উর্ধাংশে রহিয়াছে, অর্থাৎ সর্বদা মাথা ধরা, মাথা ঘুরানী, অনিদ্রা এবং হৃদ-সংকোচনের পীড়া তীব্রতার সহিত আক্রমণ করে। দ্বিতীয় চাদর যাহা আমার দেহের নিম্নাংশে বিদ্যমান, তাহা হইল বহুমুত্র রোগ, যাহাতে আমি দীর্ঘকাল হইতে ভুগিতেছি। কোন কোন সময় শত শত বার রাত্রে কিম্বা দিনে আমার প্রস্রাব হয় এবং এত মুত্রাধিক্যের ফলে যে দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গ ঘটিয়া থাকে তাহা সবই আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে। অনেক সময় আমার অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে, (মসজিদে বা-জামাত) নামাজের জন্য যখন আমি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠি তখন আমার বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এই আসা থাকে না যে, সিঁড়ির এক ধাপ হইতে অপর ধাপে পা রাখা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকিতে পারিব। এখন, যে ব্যক্তির জীবনের এই অবস্থা যে, প্রতি দিন মৃত্যুর আশংকা তাহার সম্মুখীন থাকে এবং এইরূপ রোগীদের উক্ত পরিণামের নযীর সমূহও বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন সে এমন ভয়াবহ অবস্থা সহকারে কিরূপে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপের দুঃসাহস করিতে পারে? এবং সে কোন স্বাস্থ্যের জোরে এ কথা বলে যে, সে আশি বৎসর আয়ু লাভ করিবে। অথচ চিকিৎসা বিদ্যায় লব্ধ অভিজ্ঞতা মুলে এইরূপ ব্যক্তি তো সর্বদা মৃত্যুর কবলেই পতিত বলিয়া বিবেচিত হয়। এরূপ রোগীগণ ক্ষয়-জরাক্রান্তের ন্যায় লয়প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা কার্বাঙ্কলে তাহাদের জীবনাবসান ঘটিয়া থাকে। তথাপি, যে জোরের সহিত আমি এরূপ আশংকাপূর্ণ অবস্থায়ও আল্লাহর বাণী প্রচার ও তবলীগের কাজে

মশগুল ও কর্মতৎপর রহিয়াছি; তাহা কি কোন মিথ্যাদাবীকারকের কাজ হইতে পারে? যখন আমি আমার দেহের উর্ধাংশে এক রোগ এবং নিম্নাংশে আর এক রোগ প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার দিল অনুভব করে যে, ইহা সেই দুই চাদর, যাহার সংবাদ হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম দান করিয়া গিয়াছেন।

আমি ঐকান্তিকভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উপদেশ ও হিতাকাংক্ষা স্বরূপ বিরুদ্ধবাদী উলামা এবং তাহাদের মতানুসারী লোকদিগকে বলিতেছি যে, গাল-মন্দ দেওয়া এবং , কটু কথা বলা ভদ্রতার পরিচয় নয়। যদি আপনাদের ইহাই প্রকৃতি ও স্বভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আপনাদের অভিরুচি। কিন্তু যদি আপনারা আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আপনাদের এই অধিকারও তো আছে যে, মসজিদগুলিতে একত্রিত হইয়া অথবা পৃথক ভাবে আমার বিরুদ্ধে বদ-দোওয়া করেন, এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার বিনাশ ও ধ্বংস কামনা করেন। অতঃপর আমি যদি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনাদের সেই সকল দোওয়া কবুল হইবে, এবং বস্তুতঃ আপনারা সর্বদা এরূপ দোওয়া করিয়াও থাকেন, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে, যদি দোওয়া করিতে করিতে আপনাদের জিহ্বায় ক্ষতও পড়িয়া যায় এবং ক্রন্দন করিয়া সেজদা করিতে করিতে আপনাদের নাসিকাও ক্ষর্ব হইয়া যায় এবং অশ্রু ঝরিতে ঝরিতে চক্ষের গর্তগুলি গলিয়া যায় এবং পলক সমূহ ঝরিয়া যায় এবং অধিক ক্রন্দনের ফলে দৃষ্টিশক্তিও লোপ পায় এবং পরিশেষে মস্তিষ্ক শুন্য হইয়া মৃগির আক্রমণ হইতে থাকে অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, তবুও আপনাদের সেই সকল দোওয়া কবুল হইবে না। কেননা আমি খোদার তরফ হইতে আসিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার উপর বদ-দোওয়া করিবে, সেই দোওয়া তাহার উপরই পড়িবে। যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে ইহা বলে যে, তাহার উপর লা'নত বর্ষিত হউক, সেই লা'নত তাহার হৃদয়ে বর্ষিত হয়; কিন্তু সে উহার খবর রাখে না। যে ব্যক্তি আমার সহিত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাব্যস্ত করিয়া এই দোওয়া করে যে, 'আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে যেন প্রথম মৃত্যুবরণ করে', তাহা হইলে উহার পরিণাম তাহাই ঘটিবে যাহা মৌলবী গোলাম দস্তগীর প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। কেননা সে সর্বসাধারণে প্রকাশ করিয়াছিল যে 'মির্যা গোলাম আহমদ যদি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে, এবং সে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী, তাহা হইলে সে আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিবে এবং যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তাহা হইলে আমি প্রথমে মরিব।" সে (গোলাম দস্তগীর) এই দোওয়া করিয়াছিল। তারপর নিজেই কয়েকদিন পর মরিয়া গেল। তাহার সেই পুস্তক প্রকাশ না হইলে কেহ কি উক্ত ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারিত? কিন্তু এখন তো সে তাহার নিজের মৃত্যুর দ্বারা আমার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যে এরূপ

করিবে এবং এইভাবে দোওয়া করিবে, সে নিশ্চয় গোলাম দস্তগীরের ন্যায় আমার সত্যতার সাক্ষী হইয়া যাইবে। উত্তম, ইহা চিন্তা করিবার বিষয় যে, লেখরামের নিহত হওয়া সম্পর্কে কতিপয় দুস্কৃতিপরায়ন অত্যাচার প্রবণ জালেম স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি যদিও আমার জামাতকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া অপবাদ দিয়াছিল—যদিও উহা এক বিরাট নিদর্শন ছিল যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহা এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যাহা পূর্ণ হইয়াছিল—তথাপি বলুন, মৌলবী গোলাম দস্তগীরকে আমার জামাতের মধ্যে কে হত্যা করিল? ইহা কি সত্য নয় যে, আমার অনুরোধ ব্যতিরেকে সে নিজেই ঐরূপ দোওয়া করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে? কেহ পৃথিবীর উপর মৃত্যু বরণ করিতে পারে না, যতক্ষণ না আসমানে সে মৃত সাব্যস্ত হয়।

আমার আত্মায় সেই সাচ্চায়ী (সত্যতা) রহিয়াছে যাহা ইব্রাহীম আলাহিস্সালামকে দান করা হইয়াছিল। খোদাতায়ালার সহিত আমার ইব্রাহিমী সম্বন্ধ। কেহ আমার রহস্য জানে না কিন্তু খোদা জানেন। বিরুদ্ধবাদীরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংস করিতেছে। আমি এমন চারাগাছ নাই যে তাহাদের হস্তক্ষেপে উৎপাটিত হইতে পারি। যদি তাহাদের পূর্ববর্তীগণ, তাহাদের পরবর্তীগণ এবং তাহাদের জীবিত ও মৃতগণ সকলে মিলিত হয় এবং আমার মারার বিরুদ্ধে দোওয়া করে, তাহা হইলে আমার খোদা তাহাদের সমস্ত দোওয়া লা'নতে রূপান্তরিত করিয়া তাহাদেরই মুখের উপরে নিক্ষেপ করিবেন। দেখুন, সহস্র সহস্র প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আপনাদের দল হইতে বাহির হইয়া আমাদের জামাতে আসিয়া যোগদান করিতেছে। আসমানে এক মহারব উঠিয়াছে, এবং ফেরেশ্তাগণ পবিত্র মানবহৃদয়গুলিকে আকর্ষণ করিয়া এ দিকে আনয়ন করিতেছে। এখন এই আসমানি কার্যক্রমকে কি মানুষ রোধ করিতে পারে?! উত্তম, যদি কিছু শক্তি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে রোধ করিয়া দেখাও। নবীগণের বিরুদ্ধবাদীগণ যে সমস্ত কলা কৌশল ও ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে, তাহা সব কিছুই তোমরাও কর এবং কোন চেষ্টা-চরিত্রের ত্রুটি রাখিও না। সর্বশক্তি প্রয়োগ কর, এত বদ-দোওয়া কর যেন মৃত্যু পর্যন্ত গিয়া উপস্থিত হও, তারপর দেখ, কি বিগড়াইতে পার। খোদাতায়ালার আসমানী নিদর্শনাবলী মুশলধারে বর্ষিতেছে কিন্তু হতভাগ্য মানুষ দূরে থাকিয়া আপত্তি উত্থাপন করে। যে হৃদয়গুলিতে মোহর লাগিয়া গিয়াছে, তাহাদের আমরা কি চিকিৎসা করিব? হে খোদা! তুমি এই উম্মতের উপর রহম কর, দয়া পরবশ হও। আমীন।"

নিবেদক—মীর্যা গোলাম আহমদ, কাদিয়ান।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০ইং

(আরবাইন ৩য় ও ৪ খণ্ডের পরিশিষ্ট পৃ: ৪—৭)

অনুবাদ: আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খুৎবা

সাইয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

[তারিখ ১লা মার্চ্চ, ১৯৬৭ ঈসাব্দ, স্থান : মসজিদে মোবারক রাবওয়া]

তাক্ওয়ার পন্থা সমূহ অবলম্বন কর, এবং উহার দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করিবার চেষ্টা কর, তাক্ওয়া কোন একটি আমলে সালেহের নাম নহে, বরং যাবতীয় নেক আমল এবং কথার কৈফিয়তের নাম তাক্ওয়া।

তাশাহ্-হুদ, তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুজুর বলেন।

কোরআন করীমে যেই পরিমাণ তাক্ওয়া অবলম্বন করিবার প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে, অন্য কোন নির্দেশের প্রতি এত জোর দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, তাকওয়া একটি নেক কথা, নেক বিশ্বাস, নেক কাজের নাম নহে, বরং যাবতীয় আমলের কৈফিয়তের নাম, যাবতীয় পবিত্র বিশ্বাসের যে নাম রাখা হয়, সেই কৈফিয়তের নাম। উহার সম্পর্ক প্রত্যেক কথা প্রত্যেক বিশ্বাস এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে। যাহা সময়োপযোগী পবিত্র এবং নেক হইবে। প্রথমে আল্লাহতালা সুরা বাকারায় খুব জোর করিয়া আমাদিগকে ইহার প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ইহা বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছেন— তোমার প্রতি 'আল কেতার' অবতীর্ণ করা হইতেছে, যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ যুক্ত পথ পাইবেনা, আলকেতাব-লা রাইবা উহার গুণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, هدى للمتقين এক হেদায়েত নামা এক খুবই সুন্দর শিক্ষা, এক এমন শরীয়ত যাহা নিম্ন হইতে সর্বোচ্চ আকাশ পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। সেই কেতাব তোমাদের হাতে দেওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা ভূলিবে না যে, শরীয়ত শুধু মাত্র তাহাদিগকেই সফলতা দান করে যাহারা দৃঢ় ভাবে তাকওয়া অবলম্বন করে। যদি কেহ খুব নামায পড়ে, যদি কেহ নিজের অর্থ উপযুক্ত প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে দান করিয়া থাকে, যদি কাহারও কথা খুবই মধুর হয়, যদি বাহ্যিকভাবে কেহ সহানুভুতি এবং মঙ্গলাকাঙ্খী হয়, কিন্তু যদি তাহার এই সব কাজ তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা আল্লাহ্তায়ালার নিকট গৃহিত নহে। এই জন্য এই মহাগ্রন্থ পরিপূর্ণ হেদায়েত নামা অনুযায়ী আমল করিলেও যদি তাকওয়া বিহীন হয় তাহা হইলে তুমি সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। সফলতা

সেই লাভ করিবে যে তাকওয়ার সহিত দৃঢ় ভাবে ধারণ করিয়া ইসলামী আহ্‌কাম পালন করিবে।

অপর জায়গায় ইহা পরিষ্কার করিতে যাইয়া আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন।

যে ব্যক্তি তাকওয়ার সূক্ষ্ম
পথ অবলম্বন করিবে
انما يتقبل الله من المتقين ٥

তাহার আমল কবুলিয়তের আসন লাভ করিবার নিকবর্তী হইবে। নতুবা উহা গৃহিত হইবে না। এবং আল্লাহ্‌তায়ালা উহার পুরস্কারের কোন মীমাংশা করিবেন না। অতএব هدى للمتقين এর মধ্যে এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে. তাহারাই এই হেদায়েত হইতে উপকৃত হইবে এবং উপকৃত হইতে থাকিবে। যাহারা তাকওয়ার ছেফতে দৃঢ়তা অবলম্বন করিবে। যাহার তাকওয়া খুবই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। নতুবা আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার আমল গ্রহণ করিবেন না তাকওয়া ও অন্যান্য বস্তু যেমন আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহের দ্বারা লাভ করা যায়, এইভাবে তাকওয়াও আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে লাভ করা যায়, যথা আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা ফতহার মধ্যে বলিয়াছেন :—

والزمهم كلمة التقوى

তাকওয়ার পন্থার উপরে তিনি নিজে তাহাদের পদকে দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন, মানুষ নিজের চেষ্টায়, নিজের মেহনতে তাকওয়ার পথে দৃঢ়তার সহিত পদ রাখিতে পারে না। হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) তাকওয়ার অর্থ করিয়াছেন, তিনি যমীমা বারাহীনে আহ্‌ম-দীয়ার পঞ্চম খণ্ডে ৫১, ৫২ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছে :—

"এবং তাকওয়া এই যে মানুষ খোদাতায়ালার যাবতীয় আমামত এবং ইমানী অঙ্গিকার এবং সৃষ্টির যাবতীয় আমানত ও অঙ্গিকারের প্রতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে অর্থাৎ সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম দিকের প্রতি যথাসাধ্য মনোযোগ দিবে।"

তাকওয়ার এই অর্থ বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন করীমে খুব পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :—

ولكن الله حبب اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون
(حجرات : ١٨)

এখানেও তাকওয়ার অর্থ এক সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অন্তরে ইমানের মহব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের অন্তরে নিজ অনুগ্রহে এই প্রকৃত তথ্য পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য তাকওয়া ব্যতীত সম্ভবপর নহে।

তাকওয়া যেমন এক দিক দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ পালনে অন্তরে প্রফুল্লতা দান করে এবং অপর দিক দিয়া অন্য সর্ব প্রকারের ঘৃণা সৃষ্টি করে যাহা আল্লাহ্‌-তায়ালার দাসত্ব হইতে বাহিরে লইয়া যায়। এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তুষ্টি ক্রয় করিয়া লয় এই খানে আল্লাহ্‌তায়ালা তাকওয়ার এক সুক্ষ্ম বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার তফসীল ত আমি এখন করিব না, যাহা হউক ইহাই যথেষ্ট। কারণ সুরা বাকারায় অন্য স্থানে ১৯০ আয়াতে বলিয়াছেন :—

ولكن البر من اتقوى و اتقوا الله لعلكم تفلحون -

অর্থাৎ পুর্ণ নেক সেই ব্যক্তি নহে, যে নিজের সব সময়কে নামাযের মধ্যে ব্যয় করে অথবা নিজের অর্থ সমূহ খোদার সৃষ্টির মহব্বতে এবং প্রয়োজনে ব্যয় করে অথবা হজকরে অথবা রমজানের রোজা রাখে, বরং পুর্ণ নেক উহাই যাহারা তাকওয়ার যাবতীয় পন্থা সমুহের প্রতি খেয়াল রাখে, অবশিষ্ট নেক কাজ অথবা পবিত্র কথা যাহা আছে, তাহা ইহা হইতে বহির্গত হইয়া থাকে যেমন এক মুল হইতে কোন গাছের শাখা বাহির হয় যাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং কিছু অগ্রসর ও হইয়া আমি আরও বলিব, অতএব এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :—

পূর্ণ নেক البر উহা

যাহা যাবতীয় তাকওয়ার পথে গতিশীল! বলিয়াছেন—যে মূল নির্দেশ তোমাকে এই দেওয়া হইতেছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার তাকওয়া অবলম্বন কর। যদি তোমরা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করিবে, তাহা হইলে যাবতীয় নেকী তোমরা পালন করিবে, এবং ইহাতেই তোমরা এমন সাফল্য অর্জন করিবে যাহার তুলনা পৃথিবীতে তাকওয়া ব্যতীত পাইবে না।

সত্য ইহাই যে, যথা হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) আইয়ামোচ্ছোলাহ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :—তাকওয়া প্রত্যেক অন্যায় হইতে বাঁচিবার শক্তি দেয় এবং প্রত্যেক নেকী অর্জনের দিকে দৌড়াইয়া যাইবার চলন শক্তি দান করে। এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে পর্যন্ত না মানুষ তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে সে পর্যন্ত আত্মা সেই সব গুণ এবং শক্তি বিকাশের উপকরণ কোরআন হইতে পায় না। যাহা রূহ খুশী হয়, এবং শান্তি পায় এই বিষয়ও هدى للمتقين এর মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাকওয়া ব্যতিরেকে আত্মার সেই গুণ এবং শক্তি বিকাশের উপকরণ কোরআনে পাওয়া যাইবেনা, পরন্ত কোরআন মজিদ ত এখানে বিদ্যমান, যাহাকে পাইয়া আত্মার মধ্যে এক স্বাদ এবং আস্বস্ত পয়দা হয়।

এই বিষয়টি যে সব নেকীর সহিত তাকওয়ার সম্পর্ক রহিয়াছে, হযরত মসীহ মউওদ (আঃ) বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

এক স্থানে বলিয়াছেন যে, তাকওয়া প্রত্যেক বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য সুরক্ষিত দুর্গ (আইয়ামুছোলাহ) তাকওয়া এমন এক সুদৃঢ় দুর্গ যাহাতে নেক কথা এবং নেক আমল উহাতে প্রবেশ করে। তাহা হইলে সে শয়তানের প্রত্যেক আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইয়া যায়। কিন্তু বাহ্যত কোন ব্যক্তি যতই পাক এবং নেক দেখা যাক না কেন যে পর্যন্ত সে নিরাপদ দুর্গে প্রবেশ না করে সে পর্যন্ত সে শয়তানের আক্রমণ হইতে বাঁচিতে পারিবে না। যে কোন সময় শয়তান তাহার উপর আক্রমণ করিতে পারে। ভণ্ডামি সৃষ্টি হইতে পারে। অহঙ্কার সৃষ্টি হইতে পারে। যদি তাকওয়া থাকে তাহা হইলে উহাতে কোন অন্যায় পয়দা হইতে পারে না অর্থাৎ শয়তান সফল আক্রমন করিতে পারে না।

আল্লাহতায়ালা কোরান কারীমে এই বিষয়টি আর একটি জায়গায় বলিয়াছেন এবং হযরত মসিহ মাওউদের (আঃ) এই বাণী যাহা আমি এখনই বলিলাম, এবং উহার অন্তর্নিহিত মর্ম ইহাই। আল্লাহতায়ালা সুরা দোখানে বলিয়াছেন : ان المتقين فى مقام امين নিশ্চয় মোত্তাকী এক নিরাপদ গৃহে সুরক্ষিত রহিয়াছে, ইহাই সেই নিরাপদদূর্গ। ইহাই আমিনের অর্থ। যাহা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) করিয়াছেন। সুরক্ষিত এবং নিরাপদে সেই ব্যক্তি রহিয়াছে যে ব্যক্তি তাকওয়ার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি তাকওয়ার উপরে নহে, তাহার জন্য আশংকা আছে, সে ব্যক্তি নিরাপদ কিনা সে ভীত অবস্থায় আছে, এবং এইরূপ ব্যক্তি শান্তিতে নাই। এবং সে এইরূপ স্থানে আছে যাহাকে জাহান্নাম বলা যাইতে পারে। অতএব কোরআন কারীমই তাকওয়ার অন্তর্নিহিত দিক দিয়া সুদৃঢ় দুর্গের কল্পনা সমুপস্থিত করিয়াছে। তাকওয়ার পথে চলাব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নিরাপদে থাকিতে পারে না। তাকওয়া ব্যতীত এই সুদৃঢ় দুর্গে প্রবেশ করার অন্য কোন পথ নাই।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এই বিষয়টি অন্য স্থানে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে,

ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے -

প্রত্যেক নেকী চাই উহা কথা হউক, অথবা কাজ হউক, উহা তাকওয়ার মূল হইতে বহির্গত। যাহার অর্থ এই যে, কোরআন কারীম যে শত শত নির্দেশাবলী দিয়াছে। যখন আমরা উহার প্রতি আমল করি এবং এইভাবে আমল করি যে উহা আল্লাহতায়ালার

বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার উপায় হয় এবং আল্লাহ্‌তায়ালার বেহেশ্‌তের বৃক্ষের ডাল হইতে পারে এবং সেই বৃক্ষের জন্য পানির কাজ দেয়। ইহা এই ভাবে হইতে পারে যখন এই শাখা তাকওয়ার মূল হইতে বাহির হয়।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর যাবতীয় বাণী

প্রকৃতপক্ষে কোরআন করীমেরই ব্যাখ্যা। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যে, এই কল্পনা সমুপস্থিত করিয়াছেন যে,

নিম্ন আয়াতের তফসীর :—

كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء توتى اكلها كل حين باذن ربها - ويضرب الله الا مثال للناس لعلهم يتذكرون ○

এই খানে আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন যে, তোমরা দেখিতেছ না? যে, আল্লাহতা'লা কিভাবে এক পবিত্র বাণীর (অর্থাৎ কোরআন করীমের সত্যতা বর্ণনা করিয়াছেন, কতেক উহা এইরূপ, যাহার উদাহরণ এক পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়, যাহার মুল দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আল্লাহতা'লা মোত্তাকি বানান এবং তাকওয়ার পথে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই ভাবে দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তৎপর উহা হইতে শাখা বাহির হয় যাহা সঠিক বিশ্বাস হয় অর্থাৎ মানুষের বিশ্বাস সমূহ শাখা সমূহের আকৃতি ধারণ করে (রূপক ভাবে) যাহা আদেশ নিষেধের অন্তর্গত এবং ইহা সেই বৃক্ষে যাহার প্রত্যেক শাখা আকাশ চুম্বি, আমলে ছালেহের পানির দ্বারা প্রতিপালিত হইবার দরুন, অর্থাৎ কোন কলুষ অংশ উহাতে সংমিশ্রত নহে প্রত্যেক শাখা স্বাস্থ্যবান এবং উন্নয়ন শীল এং আকাশে যাইয়া পৌঁছে, এবং আল্লাহ্‌তায়ালা এইখানে এই কথা বলিয়াছেন যে

যখন তাকওয়ার মূল দৃঢ় হয়,

এবং সেই মূল হইতে নেকীর এবং পবিত্রতার ও ধার্মিকতার শাখা সমুহ বাহির হয়, তখন সেই শাখা সমুহ শুধু যে খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে তাহাই নহে বরং এই পৃথিবীতেও (পরবর্তীকালে ত হইবেই) সেই শাখাসমুহে নিত্য নতুন ফল ধরিতে থাকে, যদ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, অর্থাৎ ইহ-কালেই মানুষ আল্লাহ-তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করে এবং আত্মা ও প্রতি মুহূর্তে খুশী এবং স্বাদ গ্রহণ করিতে

থাকে, সেই সব ফল খাইবার দরুন এই সব খাদ্য আধ্যাত্মিক ভাবের যেই পর্যন্ত সেই ফল পাইবেনা সেই পর্যন্ত প্রাচুর্যতা ও লাভ করিতে পারিবে না, এবং স্বাদ ও পাইবে না। বিশ্বাস সঠিক না হওয়া পর্যন্ত সেই ফল ও পাইবেনা, সময়োপযোগীতার পানি ও সিঞ্চন করিতে পারিবে না, যাহা তাকওয়ার মুল হইতে বহির্গত হইয়া আকাশ পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে। এই ভাবে সেই সকল আমল কবুল করেন। আমাদের কোন কাজ কবুল করাই উহার ফল। কারণ উহার ফলেই মানুষ তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করে। অতএব প্রত্যেক নেকীর মূল এই তাকওয়া, যাহার এই মূল নাই সে বহু প্রকারের নেকী করিলেও কোন ফল হইবেনা, কারণ উহা হইতে সেই শাখা সমুহ বাহির হইবেনা, যাহা রহমান খোদা পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে, না সেই ফল ধরিবে যাহাতে অধ্যাত্মিকভাবে আরাম পাওয়া যাইবে। এই বিষয়টি হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) কোরআন করীমের তফছীর করিতে যাইয়া অন্যত্র বলিয়াছেন :—

"প্রকৃত তাকওয়া নিজেয় সঙ্গে এক আলো রাখে" (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম)

যেইসব পবিত্র বিশ্বাস বা নেক আমল আলোর পরিবেষ্টনে পরিবেষ্টিত নহে উহা গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, উহা না মঞ্জুর হয়। কিন্তু যখন মানুষের কথা এবং কাজ তাকওয়ার আলোর মণ্ডলে বেষ্টিত হয়, তখন আল্লাহ্তায়ালার নিকট উহা খুবই প্রিয় এবং পছন্দনীয় হয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) উহার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, তাঁহারই ভাষণ এই বিষয়টীর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ছোট উদ্ধৃতি আমি লইয়াছি তাহা এই খানে বর্ণনা করিতেছি। আইনায়ে কামালাতে তিনি বলিতেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন :

يا ايها الذين امنوا ان تتقو الله يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم
و يجعل لكم نورا تمشون به ٥

হে মোমেনগণ। যদি তোমরা মোত্তাকী থাকিতে দৃঢ় থাক এবং এত্তেকার গুণে প্রতিষ্ঠা এবং দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমার মধ্যে এবং অপরের মধ্যে পার্থক্য রচনা করিবেন (এক ফোরকান তোমাকে দান করিবেন।) সেই পার্থক্য এই যে তোমাকে এক আলো প্রধান করা হইবে। যেই আলো দ্বারা তুমি পথ চলিবে, অর্থাৎ সেই আলো তোমাদের কাজে কথায় এবং শক্তিও অনুভূতির মধ্যে আসিবে, তোমাদের বিবেকে জ্যোতিঃ হইবে এবং তোমাদের বিবেচনার কথার মধ্যে আলো হইবে এবং চোখের দৃষ্টিতে আলো হইবে। তোমাদের কর্ণ এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, তোমাদের

(খুৎবার বাকী অংশ ২১-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৯)

স্ত্রীজাতির সংখ্যাধিক্য-জনিত নিদর্শন

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর যমানার আর একটি চিহ্ন স্ত্রীজাতির সংখ্যাধিক্য হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত রয়েছে। পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে বেশী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী যথা সময়ে পূর্ণ হয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে বিভিন্ন যুদ্ধে পুরুষদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পায়। অবস্থা এই দাড়িয়েছে যে, এই সমস্যার মোকাবেলার জন্য সমাজ-বিজ্ঞানীরা এখন এইসব দেশে ইসলামী মতানুসারে পুরুষদেক একাধিক বিবাহ করতে উৎসাহিত করছেন। যদি ইসলাম-সমর্থিত আইনসম্মত উপায়ে পুরুষদেক একাধিক বিবাহ করতে দেওয়া না হয় (যুদ্ধজনিত কারেন মেয়েদের সংখ্যা অধিক হওয়ায়), তাহলে সমাজে বহু সমস্যা দেখা দিবে—বিশেষতঃ অবৈধ সম্পর্ক, নৈতিক শিথিলতা এবং বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সেজন্যই আজকাল দ্বিতীয় বিবাহকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত এই পরিস্থিতির জন্য সমাজের চিন্তাধারার এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা যেখানে এরূপ, সেখানে শিক্ষিত মুসলমানগণ অনেক সময় ইসলামের একাধিক বিবাহ প্রথার জন্য লজ্জাবোধ করে থাকেন কেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিবাহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন উভয়ই আধুনিক কালের জন্য সত্যসত্যই অভিনব বিষয়।

উটের ব্যবহার হ্রাস সংক্রান্ত নিদর্শন

বর্তমান যুগের শক্তিচালিত নানাবিধ যানবাহন, ষ্টীম ইঞ্জিন, মোটর গাড়ী ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহদীর যুগ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যায়িত করেছে। আরব দেশের অবস্থা দৃষ্টে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রতিশ্রুত যুগ সম্বন্ধে বলেছিলেন : ولیترکن القلاص فلا یسعی علیها (ওলা তরাকা ~~ইয়াইবেকু~~ন্নাল কালাস ফালা ইউসায়া আলাইহা)

অর্থাৎ:—"যানবাহন হিসেবে উটের ব্যবহার বিলুপ্ত হবে।" (সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান যুগে সন্দেহাতীত রূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই পরিবর্তন পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তৃতি এবং শিল্পায়ণের প্রকালে শুরু হয়েছিল।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বাষ্পচালিত যানবাহন এবং জাহাজগুলো হলো দাজ্জালের গাধা—এগুলো জল ও স্থলে ভ্রমণ করে এবং চলার সময় চতুর্দিকে মেঘের ন্যায় ধোঁয়া ছড়ায়। আধুনিক যানবাহনগুলোর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ হতে প্রচারকগণ চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে। এই সকল যানবাহনে জ্বালানী হিসেবে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করা হয়। ভবিষ্যদ্বাণীতে দাজ্জালের গাধার খাদ্যরূপে কয়লা ব্যবহৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। দাজ্জাল এবং দাজ্জালের গাধা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে (এ সম্বন্ধে পরে উল্লেখ করা হবে)।

অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত নিদর্শন

ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত যুগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ঐ সময়ে সোনা ও রূপার প্রাচুর্য হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান যুগে সুস্পষ্টাকারে পূর্ণ হয়েছে। উন্নত ধরণের মাইনিং (খনি হতে উত্তোলন এবং বিশুদ্ধিকরণ) পদ্ধতির ফলে এরূপ হতে পারে, অন্যান্য কারণেও এই সকল মুল্যবান ধাতুর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। কিন্তু একথা সত্য যে, সোনা-রূপার ব্যবসা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া হলো আর একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। এই ভবিষ্যদ্বাণী দালামীর মতানুসারে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবীর সকল বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় সরকারের ঋণের জন্য সুদের আদান-প্রদান ব্যবস্থা সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। এখন সকল জাতির সর্বশ্রেণীর লোক এই সুদ ব্যবস্থার মধ্যে অংশ নিচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো এই যে, (আর এতেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বিশেষত্ব ও লক্ষ্য করা যেতে পারে)—যদিও পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেক সুদের ব্যবহারকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (সুরা বাকারা : ১৮০), তথাপি সুদের হাত হতে তাঁরা মুক্ত নয়—যদিও মনের মধ্যে অনেকেরই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভাব রয়েছে।

আর একটি নিদর্শন হলো এই যে, সেই সময় খৃষ্টানগণ জগতে সবচেয়ে বেশী ধনী হবে। নওয়াজ বিন সামান হতে এ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, দাজ্জাল তাকে এবং তার নেতৃত্বকে গ্রহণ করার জন্য লোকদিগকে আহ্বান জানাবে। যারা অস্বীকার করবে

তারা দরিদ্র থেকে যাবে এবং যারা তাকে গ্রহণ করবে তারা ধনী ও সম্পদশালী হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পুর্ণতা সম্বন্ধ কোন মন্তব্য নিষ্প্রোয়জন। কেননা পাশ্চাত্যের খৃষ্টানজাতির অর্থনৈতিক শৃংখলে আজ পৃথিবীর অপরাপর জাতিসমুহের অবস্থার স্বরূপ কারে অবদিত নয়।

রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কিত নিদর্শন

হাদীস শরীফে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কিত নিদর্শন প্রতিশ্রুত যুগের জন্য বলা হয়েছ সেগুলো প্রধাণতঃ মুসলিম জগতের জন্য প্রযোজ্য। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন (হোজাইফা বিন আল-ইয়ামান হতে বর্ণিত):

"আখেরী যমানার মুসলমানদের অবস্থা হবে ইহুদীদের মত। ইহুদীদের মত তারা রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হবে এবং অন্যদের দয়া ও আনুকুল্যের উপর বসবাস করবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী কত সুস্পষ্টাকারে পূর্ণ হয়েছে! মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি ক্রমান্বয়ে অধঃপতিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই অধঃপতন চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। এরপর হতে অবশ্য অবস্থার কিছু পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে এক-দুই করে মুসলিম দেশ স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার্থে অনেক পাশ্চাত্য দেশ তথা খৃষ্টান জাতির শক্তির উপর তাদেক নানাভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে।

আর একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে:—

"ইরাক তার উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং সম্পদের অংশ দিতে অস্বীকার করবে; মিশরও ঐরূপ করবে এবং তোমরা (আরববাসীগন) ঠিক সেইভাবে বিভক্ত এবং খণ্ডিত হবে যেভাবে তোমরা এককালে ছিলে।" (সহী মুসলিম, কিতাবুল ফিতান এবং আশরাতুল সা'ত দ্রষ্টব্য)।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, মিশরও তুরস্ক পৃথক পৃথক স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আরবভূমি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

আর একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে গগ্ ও মেগগ্ তথা ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে এই দুইটি শক্তিশালী জাতির আবির্ভাব এবং অন্যান্য সকল জাতির উপর তাদের আচ্ছন্নকারী প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম ও তিরমিজি শরীফে নেওয়াস বিন সামান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে:

"হাররেজ এবাদি এলাত্তুরে ফাইন্না কাদ আনযালতু এবাদি লা ইয়াদানে লে আহাদেন বেকেতালেহীম: কালা ওয়া ইয়াব-আছুল্লাহু ইয়াজুজা ওয়া মাজুজা।"

অর্থ :—"আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে নির্দেশ দিবেন : আমার বান্দাদেক সিনাই পর্বতে নিয়ে চলো—আমি পৃথিবীতে কতক লোক পাঠিয়েছি যাদের সঙ্গে কারো যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই।"

ইয়াজুজ ও মাজুজ হলো দুইটি রাজনৈতিক শক্তিদল বা Power Bloc যাদেক সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্য শক্তি এবং প্রাচ্য শক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এই দুইটি দল পরস্পরের সহিত এমনভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত যে তাদের সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের আকারে আর একটি মহাবিভিষীকাময় তাণ্ডবলীলা অনিবার্য হয়ে উঠছে। মোটমুটিভাবে প্রাচ্যের জাতিগুলো রাশিয়ার সংগে এবং পাশ্চাত্যের জাতিগুলো আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সংগে নানাভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে।

বাইবেলও এ সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে :

"Gog, the chief Prince of Meshech and Tubal and Magog and among them that dwell carelessly in the isles" (Ezekiel, 39 : 1, 6)

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর এই দুইটি রাজনৈতিক শক্তির প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। সুতরাং গগ্‌ ও মেগগ্‌ তথা ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব এ কথা কি প্রমাণ করে না যে, প্রতিশ্রুত মসীহও নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে এসে গেছেন? বস্তুতঃ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যথাসময়ে হযরত মসীহ মওউদ এবং ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হয়ে ইয়াজুজ-মাজুজের কবল হতে মানব-জাতিকে রক্ষা করার উৎকৃষ্ট-তম পথ-নির্দেশ সম্বলিত এক শান্তিপূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াত-উল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান)

(জুমার খুৎবার বাকী অংশ)

বর্ণনার মধ্যে এবং তোমাদের গতিশীলতা এবং নীরবতার মধ্যে আলো হইবে এবং যে পথে তোমরা চলিবে সেইসব পথ তোমাদের জন্য আলোকিত হইবে। মোট কথা তোমাদের সব পথই, তোমাদের শক্তির পথ সমূহ, তোমাদের ইন্দ্রিয়ের পথ সমূহ সবই নুরের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে এবং তোমাদের আপাদ মস্তক আলোর মধ্যেই চলিবে ”

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম)

আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত আয়াতের মধ্যে এই সত্যই বর্ণনা করার জন্য বলিয়াছেন যে প্রত্যেক সেই কর্ম যাহা তাকওয়ার মূল হইতে বহির্গত হয় নাই, যাহা তাকওয়ার দূর্গে সুরক্ষিত নহে, যাহা তাকওয়ার জ্যোতিমণ্ডলে আলোকিত নহে উহা গৃহিত হইতে পারে না, এবং যে ব্যক্তিকে আল্লহ্‌তায়ালা তাকওয়া দান করেন, তাহার সারা জীবনকে, সারা কর্মকে সব কথাকে, সারা গতিকে এবং নীরবতাকে এমন নুর দান করেন, যেই নুরের দ্বারা অপর হইতে সে পৃথক হইয়া যায় এবং এক পার্থক্য উভয়ের মধ্যে রচিত হয়।

(কাদিয়ানের সাপ্তাহিক বদর পত্রিকার ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭৬ইং সংখ্যা)

অনুবাদক : এ, কে, মুহিবুল্লাহ,সদর মুরুব্বী

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ষষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা

তারিখ—২৮, ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর, ১৯৭৭ ইং

স্থান—দারুত তবলীগ, ঢাকা

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ষষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা আগামী ২০, ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর '৭৭ যথাক্রমে রোজ শুক্রবার (বাদ জুম্মা), শনিবার ও রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে (ইনশাআল্লাহ)। ইতিপূর্বে ইজতেমার জন্য যে কর্মসূচী পাঠানো হইয়াছিল তাহার সমস্ত বিষয়বস্তু পূর্ববত বলবত থাকিবে--শুধু তারিখগুলির স্থানে যথাক্রমে ২৮, ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর ১৯৭৭ ইং পড়িতে হইবে।

মোঃ খলিলুর রহমান

নায়েব সদর

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত দীক্ষা গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্টকান জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্তুতি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে.

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সূরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুনঃ—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা'ল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor A H. Muhammad Ali Anwar